বাংলা উপন্যাসে অরণ্য ও আরণ্যক জীবন

ভূমিকা

সুপ্রাচীনকাল থেকেই অরণ্যের সঙ্গে মানবজীবন ও মননের নৈকট্য গভীর। অরণ্য মানুষের মনে এক অনির্বর্চনীয় সৌন্দর্য্য, শিল্পবোধ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এক নিবিড় রহস্যময়তা কখনো-কখনো অরণ্য মানব-মনে আলোড়ন তোলে। তাছাড়া অর্থনীতি ও পরিবেশগত কারণে এবং অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ ও সৃষ্টির তাগিদে মানুষ অরণ্যকে সভ্যতা গঠনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহকারী হিসেবে দেখে এসেছে। বনের সঙ্গে প্রাণী জগতের এক অভূতপূর্ব অভিযোজন ও আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছে। সেজন্য অরণ্য মানুষের চিন্তা, অনুভব ও বোধের জগতে গভীর ছাপ ফেলেছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতেও অরণ্যের সবুজতা, অরণ্য-সংস্কৃতি, আরণ্যক জীবনযাত্রা, অরণ্যচারী মানুষের জীবন-সংগ্রাম, অরণ্যের রহস্যময়তা-স্নিগ্ধতা-রোমান্টিকতা ইত্যাদির অপূর্ব প্রতিফলন ঘটেছে। কাব্য ও কথাসাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই অরণ্য তার নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। তৈরী হয়েছে আন্তরিক অরণ্য-সাহিত্য।

প্রাচীন ভারতের সৃজন ও মনন জগতের সঙ্গেও অরণ্যের আত্মিক সম্পর্ক ছিল। K.P.Sagreiya তাঁর 'Forests and forestry' গ্রন্থে (National Book Trust,A-5 Green Park, New Delhi-11oo16,second reprint 2000, পৃষ্ঠা-৮) লিখেছেন- ''The Aryans were primarily pastoral people. To construct shelters for themselves and for their domesticated animals they cleared the forests wherever they went. But even so, being worshippers of Nature, they preferred for their abodes, and even for their educational centres, sylvan surroundings inspiring landscapes. It is in such setting that the Vedas, the Upanishads and the Aranyakas were composed which sing the glory of the Creator and lay down precepts of conduct for man to live righteously. Human population at this period was very small and forests were still plentiful.'' যখন মহাকাব্য 'রামায়ণ' লেখা হয়, তখনও গভীর অরণ্য ছিল যার উল্লেখ মহাকাব্যটির ভেতরে পাওয়া যায়। নানান বৈচিত্র্যময় গাছপালা ও বন্য জন্তুতে ভরা চন্দ্রকূট, দন্ডকারণ্য, পঞ্চবটী ইত্যাদি অরণ্যের কথা 'রামায়ণ'-এ উল্লিখিত হয়েছে। বনবাস-পর্ব এই মহাকাব্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর হার্দিক

সম্পর্কও 'রামায়ণ'-এ দেখা যায়। সুগ্রীব, বালী,বানরসেনানী, হনুমান এমনকি একটি পাখি জটায়ু মানবিক চরিত্র হয়ে বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। অরণ্যগভীরে নির্বাসিত হন রামচন্দ্র, কাটান এক শান্তিময় জীবন। আবার 'মহাভারত' মহাকাব্যে দেখতে পাওয়া যায় অরণ্য-ধ্বংসের ছবি। খান্ডব-বন পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এই মহাকাব্যেও দেখানো হয় কিভাবে নির্বোধ মানুষ অরণ্য নষ্ট করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বাণভট্ট-এর 'হর্ষচরিত'তে প্রকৃতি, গ্রাম আর অরণ্যানীর চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে উল্লিখিত রয়েছে 'বন-গ্রামক' বা বন-গাঁয়ের নিখুঁত বর্ণনা। বিভূতি রচনাবলী-র প্রথম খন্ডের (তৃতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৮১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২) মুখবন্ধে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ-

'ঋগবেদের দশম মন্ডলের ১৪৬ সংখ্যার সুক্তটি হচ্ছে 'অরণ্যানী' দেবীর উদ্দেশ্যে, ইরম্মদের পুত্র ঋষি দেবমুনির দৃষ্ট বা সৃষ্ট এই সুক্তটি। এই সুক্তে বৈদিক অরণ্যপ্রান্তের গ্রামের আর অকর্ষিতা আদিম অরণ্যের একটা অদ্ভুত সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। অরণ্যানী দেবীর এক আধুনিক ছায়া বাঙলা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকেদের কল্পিত দেবী 'বনদেবী' বা 'বনবিবি'র কল্পনায় যেন কিছুটা এখনো বেঁচে আছে।'

ঋগবেদের এই অরণ্যানী-সুক্ত মাত্র ছয়টি ঋক বা শ্লোক নিয়ে গঠিত। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর অনুবাদসহ মূল ছয়টি ঋক বা শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হল ঃ-

''অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যতি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতি॥''

'বনজঙ্গলের দেবতা অরণ্যানী দেবী, মনে হচ্ছে যেন তুমি হঠাৎ আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে। কি ব্যাপার, কেন, তুমি তো গাঁয়ে আসতে চাও না, তোমার ভয় হয় না তো ?'

''বৃষারবায় বদতে যদুপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানি মহীয়তে॥''

'যখন চিচ্চিক অর্থাৎ ঝিঁঝিঁপোকা আর ফড়িং পরস্পরের ধ্বনিকে বাড়িয়ে তোলে, তখন যেন মনে হয় টুঙ্ টাঙ্ করে ঘন্টার শব্দ আসছে, দেবী অরণ্যানীর পূজা হচ্ছে।'

''উত গাব ইবাদন্তি উত বেশ্মেব দৃশ্যতে।
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সজতি॥''

'ওখানে যেন গোরু চরছে ! মনে হচ্ছে ওটা বাড়ীর মতো দেখাচ্ছে, কিংবা সন্ধ্যাবেলায় অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যেন গোরুর গাড়ীর গোরু খুলে দিচ্ছেন।'

''গামংগৈষ আহ্বয়তি দার্বং গৈষো অপারধীৎ।
বসন্নরণ্যানাং সায়ম্ অক্রক্ষদিতি মন্যতে॥''

'এখানে কেউ যেন চেঁচিয়ে গোরুকে ডাকছে। আবার, ওদিকে কেউ যেন কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটছে। বনে যে থাকে, তার মনে হয়, সন্ধ্যাবেলায় কে বুঝি দূর থেকে চেঁচাচ্ছে।'

''ন বা অরণ্যানি হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নি পদ্যতে॥''

'অরণ্যানী দেবী কাকেও বধ করেন না, কেবল (হিংস্র পশু প্রভৃতি) মানুষের শত্রুই এই কাজ করে। মানুষে অরণ্যের দান মিষ্টি ফল খায়, আর নিজের ইচ্ছামত সে ঘুরে বেড়ায় বা বিশ্রাম করে।'

''আঞ্জনগন্ধিং সুরভিম্ বহ্বন্নাম্ অকৃষীবলাম্।
প্রাহম্ মৃগাণাম্ মাতরম্ অরণ্যানিম্ অংশসিষম্॥''

'আদি দেবী অরণ্যানীর এই প্রশস্তি গান করলুম, যিনি গন্ধাঞ্জনময়ী, সৌরভে পূর্ণা, যিনি কৃষি না করেও বহু অন্নের অধীশ্বরী, আর যিনি সমস্ত আরণ্য মৃগদের মাতা।'

ভারতের মানুষ অতি প্রাচীন কাল থেকেই অরণ্যের ঔদার্যে বড় হবার শিক্ষা নিয়েছে। বেদ-সংহিতাতে অরণ্যের প্রতি ভালোবাসার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। কালিদাস-এর 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে মহর্ষি কণ্বের তপোবনের বর্ণনা এবং সেখানকার আরণ্যক জীবনযাত্রা , মানব-মানবী ও বন্যপ্রাণীর মধ্যকার নির্মল সম্পর্কের বর্ণনা অরণ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "The Message of the Forest" প্রবন্ধে লিখেছেন -"The past of India is the forest, the memory of which permeats our classical literature and still hunts our minds....These forests were not merely topographical in their significance. Nature presented herself to these men in her aspect of a danger, of a barrier, which seemed to be at constant war with the land and its children.

"But in the level tract of Aryavarta men found no barrier between their lives and the Grand life that permeats the Universe. The forest gave

them shelter and shade, fruit and flower, fodder and fuel; it entered into a close living relation with their work and leisure and necessity and in this way made it easy for them to know their own lives as associated with larger life."

'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -''ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই , আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে। তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপি প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি। - বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়। তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে তা হলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন - দুই-এ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ', শুনেছিলেন 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ' - প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এ বিশ্বে। সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভঙ্গি, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।''

সাহিত্যস্রষ্টারা বারবার প্রকৃতির প্রতি অনাবিল টান অনুভব করেছেন। তাঁদের অনেকেই প্রকৃতিকে ভালোবাসার টানে এবং সেখান থেকে সাহিত্য-রসদ সংগ্রহের তাগিদে বারবার পর্যটনে বেরিয়েছেন। বিশ্বসাহিত্যে এই প্রকৃতি-পর্যটন ও পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতিতে বহু অসাধারণ সৃষ্টি আমরা পেয়েছি। উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত রোমান্টিক যুগের কবিরা - **William Wordsworth, John Keats, P.B.Shelley** প্রমুখ। কল্পনা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রকৃতি ও অরণ্যকে তুলে এনেছেন বিশিষ্ট আমেরিকান লেখক **Henry David Thoreau** তাঁর **Walden, Or Life in the Woods, The Maine Woods**-এ। **Thomas**

Hardy-র বিভিন্ন উপন্যাসে আমরা প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক দেখতে পাই। Hardy-র The Woodlanders এই ধারায় উল্লেখযোগ্য। William Henry Hudson-এর লেখা Green Mansions : A Romance of the Tropical Forest-ও অরণ্যকেন্দ্রিক সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

সাহিত্য একটি বিশাল পরিধি। কাব্য, গল্প, নাটক, উপন্যাস -প্রতিটি ক্ষেত্রে অরণ্য কতখানি ছায়া ফেলেছে তা বিশ্লেষণ করা একটি গবেষণাপত্রে সম্ভব নয়। তাই গবেষণার সুবিধা ও সুষ্ঠু বিশ্লেষণের জন্য বর্তমান প্রকল্পের অন্বিষ্ট হল -**বাংলা উপন্যাসে অরণ্য ও আরণ্যক জীবন**। কোন্ কোন্ উপন্যাসে অরণ্য এসেছে, কীভাবে সেখানে অরণ্য উপস্থাপিত হয়েছে, বিভিন্ন চরিত্রকে অরণ্য কীভাবে প্রভাবিত করেছে, আরণ্যক সংস্কৃতি ও জীবনচর্যা কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, অরণ্য কীভাবে নিজেই চরিত্র হয়ে উঠেছে , নগর ও অরণ্যের মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে ইত্যাদি তার মূল্যায়ন করাই বর্তমান প্রস্তাবিত গবেষণার প্রধান উপজীব্য। যে ঔপন্যাসিকেরা অরণ্যকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁদের ভাবনা ও উপস্থাপনায় অরণ্য নতুন নতুন মাত্রা পেয়েছে। কখনো রোমান্টিক, কখনো রহস্যাবৃত, কখনো কখনো নস্টালজিক, কখনো হিংস্র-কঠোর-সংগ্রামমুখর....অরণ্যের এই বহুধাবিস্তৃত রূপ আবিষ্কৃত হয় বাংলা উপন্যাসে। অরণ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে কোথাও আবার অনিবার্যভাবে এসেছে নগর-সভ্যতার সংঘাত। বাংলা উপন্যাসে এই বিষয়গুলি ও সমস্যাগুলি কিভাবে নির্ণীত হয়েছে , সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গবেষণাটি বিধৃত হবে।

বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে অরণ্য নিয়ে অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে। সেখানে আমরা পাই নিপুণ অরণ্য-বর্ণনা, আরণ্যক জীবনের খন্ড খন্ড ছবি। কখনো আবার লেখকের মুন্সিয়ানায় ভ্রমণসাহিত্যও পেয়ে গেছে উপনাসের মতো ব্যাপ্তি। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'পালামৌ'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর মধ্যেও উঠে আসে অরণ্য-বর্ণনা। জিম করবেটের শিকারকাহিনী কখনো কখনো তার ঘটনাপ্রবাহে, চরিত্রচিত্রণে উপন্যাসের মতো হয়ে উঠে। বাংলা বহু উপন্যাসে অরণ্য এলেও অরণ্যকেন্দ্রিক উপন্যাস সৃষ্টির ধারায় প্রধান স্রষ্টাদের রচনা নিয়েই এই প্রকল্পের কাজ। খন্ডিত ও বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ হলেও অরণ্য বিষয়ক উপন্যাস নিয়ে বিস্তৃত সমীক্ষা ও বিশ্লেষণের অভাব রয়ে গেছে। অরণ্য নিয়ে এক অনন্য ধারা বা ঘরানার সৃষ্টি ও বিকাশ যে বাংলাসাহিত্যে হয়েছে তা সমালোচকদের মূল্যায়ণের বাইরেই রয়ে গেছে। এই গবেষণা-প্রকল্পে তারই মূল্যায়ন করা হয়েছে সনিষ্ঠ

বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে।

প্রতিপাদ্য বিষয়কে পর্যালোচনার জন্য কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে ঃ-

প্রথম অধ্যায় ঃ সাহিত্য-সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,''মানবজীবনের ওপরে প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাবকে বঙ্কিমই প্রথম বাংলাসাহিত্যে যথার্থ রোমান্টিকের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন।'' বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা'তেই অরণ্য অবধারিতভাবে এসেছে। অরণ্য না থাকলে এই উপন্যাসের পরিকাঠামোই গড়ে উঠতো না। অরণ্যমানবী কপালকুন্ডলা ও অরণ্যকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নগরমানব নবকুমার অরণ্যের ভয়ালতা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাই আকস্মিক বিপদে অরণ্যের নৈকট্যে এসে তার উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও ভয় তাকে গ্রাস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু অরণ্যচারী নারী কপালকুন্ডলার হাত ধরে ক্রমে তিনি অরণ্যের আত্মার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। তবু আরণ্যক সারল্য প্রতারিত হয় নাগরিক জটিলতায়। তাই কপালকুন্ডলাকে এক ট্রাজেডীর দিকে এগিয়ে যেতে হয়। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অরণ্য হয়ে ওঠে সংগ্রামী সন্ন্যাসীসেনাদের আশ্রয়স্থল, যার কোলে তারা মুক্তির স্বপ্ন দেখে। এই অধ্যায়ে বঙ্কিম-মানসে যে অরণ্য প্রতিফলিত হয়েছে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাংলা উপন্যাসে অরণ্যকে তার সমগ্র ব্যাপ্তি, গভীরতা, সৌন্দর্য্য ও সপ্রাণ অস্তিত্বে ধরে রেখেছেন অরণ্য-উপাসক ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাগলপুর-সন্নিকটস্থ জঙ্গলমহালে কর্মসূত্রে বসবাসের অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে অরণ্য-উপন্যাস সৃষ্টির তাগিদ প্রোথিত করে। তিনি এমন একটি কথাসাহিত্য নির্মাণের কথা ভেবেছেন যাতে অরণ্যের অখন্ড নির্জনতা, গাছপালা-পাহাড়-নদী-ঝরণার অপরূপ চিত্রময়তা, এবং সেইসঙ্গে অর্থবান ও দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের দ্বন্দ্ব ধরা থাকবে। এই অরণ্য-উপন্যাস সৃষ্টির জন্য বিভূতিভূষণ তিলে-তিলে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। শুধুমাত্র অরণ্যকে নিয়ে বাংলাসাহিত্যে কোনো উপন্যাসের অস্তিত্ব ছিল না, বিশ্বসাহিত্যেও নয়। সেই অভাব পূরণ করলো বিভূতিভূষণের অসামান্য সৃষ্টি 'আরণ্যক'। এই উপন্যাসে অরণ্য তার অন্তর্নিহিত নির্যাস নিয়ে উঠে এসেছে। আরণ্যক আদিমতা ও রূঢ়তার বদলে এক বাস্তবাতীত রহস্যকে ধরবার প্রচেষ্টা, এক নিগূঢ় রোমান্টিকতা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। অরণ্যেরও যে এক নিজস্ব সত্তা রয়েছে -তাকে আবিষ্কারের এক নিবিড় আকুলতা 'আরণ্যক'কে অরণ্যসাহিত্যে সর্বোচ্চি আসন দিয়েছে। এই অধ্যায়ে বিভূতিভূষণের চেতনায় অরণ্যের প্রকাশ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা

করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আদিম অরণ্য-প্রকৃতি ও বাদাবনের আরণ্যক মানুষদের জীবনগাথা নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন মনোজ বসু। অরণ্য, জল, মাটি, মানুষ এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। সুন্দরবনের প্রকৃতি-পরিবেশ এবং জল যেন জীবন্ত চরিত্ররূপে মানবচরিত্রের পাশাপাশি প্রতিভাত হয়েছে। প্রকৃতির আদিম পটভূমিতে রহস্যাচ্ছন্ন অরণ্যভূমি, প্রাগতিহাসিক জীবনধারা, বনবিবির মাহাত্মকথা, অতিপ্রাকৃতের বিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার এবং আদিম প্রকৃতির মতোই মানুষের ভয়াল-সুন্দর কামনা-বাসনা-লোভ-প্রতিহিংসা-জিঘাংসা সম্মিলিত হয়ে উঠে এসেছে বাদাবনের নিপুণ চালচিত্র। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মনোজ বসুর উপন্যাসে সুন্দরবনের অবস্থানের কথা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জীবনধারণের সমস্যায় কিভাবে অরণ্য ধবংস হয়ে বসত গড়ে উঠছে তা মনোজ বসুর মরমী কলমে ফুটে উঠে। প্রসঙ্গত সুন্দরবন কিভাবে অন্য লেখকদের উপন্যাসে স্থান পেয়েছে তাও বিশ্লেষিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রূপকার সমরেশ বসু ও তাঁর দ্বিতীয় সত্তা কালকূট-এর উপন্যাসেও অরণ্য বিশিষ্ট জায়গা নিয়েছে। সেখানে বিভূতিভূষণের কাল্পনিক রহস্যময়তাকে বাস্তবের মাটিতে আনবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কালকূট ছদ্মনামে লিখিত অরণ্যকেন্দ্রিক তিনটি উপন্যাস 'মন চল বনে', 'বনের সঙ্গে খেলা' ও 'প্রেম নামে বন'-এর সূচনায় উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন -''স্বর্গতঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে- যাঁর পদচিহ্ন ধরে বনের মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছি।'' এই স্বীকারোক্তিতেই পরিষ্কার অরণ্য তাঁর কাছেও এক জীবন্ত সত্তা হয়ে ধরা দেয়। বনের মনকে ছুঁতে গিয়ে নাগরিকতা কিভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং কিভাবে অরণ্যের অন্দরে ও অন্তরে প্রবেশে পারা-না-পারার দ্বন্দ্ব তৈরী হয় -সমরেশ তাঁর নিপুণ লেখনীতে তা ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'দুই অরণ্য' উপস্থিত করে এক জটিল দ্বন্দ্ব ও মনস্তত্ত্বকে। অরণ্যের অনুপুঙ্খ উপস্থিতির পাশাপাশি নাগরিক কপটতার সঙ্গে তার অবশ্যম্ভাবী সংঘাত মূর্ত হয়ে ওঠে। 'দুই অরণ্য' অরণ্যকেন্দ্রিক উপন্যাসের ধারায় এক শক্তিশালী সংযোজন। এই অধ্যায়ে লেখকের দুই সত্তায় অরণ্য কীভাবে উঠে এসেছে তা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বাংলা উপন্যাসে অরণ্যকে সোচ্চার সংগ্রামের ক্ষেত্রভূমি ও হাতিয়ার করে নিয়ে এলেন ভিন্ন ঘরানার ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী। রোমান্টিক ভাবালুতা, কাব্যিক উচ্ছাস ও নিছক অফুরান অরণ্য-বর্ণনা নয়, মহাশ্বেতার বলিষ্ঠ কলমে অরণ্য হয়ে উঠল বঞ্চিত

আরণ্যক মানুষদের সংগ্রামস্থল। বনের কোলে থাকা মানুষদের ওপর তথাকথিত সুসভ্য মানবসমাজের শোষণ ও অত্যাচার মর্মস্পর্শী অথচ দৃপ্ত ভাষায় বর্ণিত হল। প্রকৃতির মধ্যে উদ্বর্তনের ধর্ম বা প্রবণতা (**Trend of survival**) রয়েছে - যা দ্বন্দ্ব-বিরোধ-সংগ্রাম ছাড়া সম্ভব নয়। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে জেগে ওঠে অদম্য আরণ্যক শক্তি, শুরু হয় উদ্বর্তনের লড়াই। লড়াকু চরিত্রগুলি শক্তি সঞ্চয় করে অরণ্য থেকেই। অরণ্য-বিষয়ক উপন্যাসের ধারায় মহাশ্বেতা দেবী এনে দেন এক ভিন্ন আঙ্গিক, বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ভাষা। এই অধ্যায়ের লক্ষ্য হল মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে অরণ্যের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বাংলা অরণ্যকেন্দ্রিক সাহিত্যের পর্যালোচনায় যাঁকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না - তিনি বুদ্ধদেব গুহ। অরণ্য-পটভূমিতে উপন্যাস-সৃষ্টির সংখ্যাতত্ত্বে নিঃসন্দেহে প্রথম স্থানটি তাঁরই দখলে থাকবে। ষাটের দশকের গোড়ায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থটির পটভূমিই ছিল অরণ্য। তারপর অনর্গল অরণ্য নিয়ে তিনি লিখে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িষা, আসাম, বিহার, গুজরাট...ভারতবর্ষের বহুধাবিস্তৃত অরণ্য তাঁর উপন্যাসে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। প্রকৃতিবাদী রোমান্টিক মনোভাবের সঙ্গে মিশে যায় তাঁর নিজস্ব মনন ও দর্শন। অরণ্যের কোলে এসে নগর-মানুষদের অকপট স্বীকারোক্তি (confession), এক নস্টালজিক দুঃখবোধ এবং সব ছাপিয়ে এক আদিম যৌন চেতনা বুদ্ধদেব গুহ-র উপন্যাসকে স্বতন্ত্র করে তোলে। আরণ্যক জৈবিক স্পৃহা গুরুত্ব পায় তাঁর উপন্যাসে। এই অধ্যায়ে ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ-র অরণ্য-উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাঁর অরণ্যচেতনাকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ গবেষণা-প্রকল্পটিতে আলোচিত বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিতে প্রতিফলিত অরণ্যচেতনার বিষয়ে একটি পর্যালোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে। এই আলোচনা অতীব অপরিহার্য। কারণ অরণ্য নিয়ে যাঁরা উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের ভাবনা ,দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োগে মৌলিকত্ব আছে । তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপায়ণের বিশিষ্টতা ও পার্থক্য নির্ধারণ করে অরণ্য যে কত প্রগাঢ় ছাপ রেখে গেছে বাংলা কথাসাহিত্যে সেই বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করা হবে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর উপন্যাসে অরণ্য মূলতঃ পটভূমি ও প্রেক্ষাপট হিসেবে এসেছে, ক্রমে তা চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে, আবার সংগ্রামের ক্ষেত্র নির্মাণেও বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব শৈল্পিক দক্ষতায়, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতায় ও কাব্যিক ভাষায় অরণ্যকেই প্রধান চরিত্র করে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসে। অরণ্য তার সামগ্রিকতা নিয়ে

এই প্রথম সাহিত্যে উঠে এল। মনোজ বসুর উপন্যাসে অরণ্যের নিসর্গ-বর্ণনার বদলে উঠে আসে বাদাবনের লড়াকু মানুষদের জীবন-আলেখ্য। বেঁচে থাকার তীব্র তাগিদে মানুষ কীভাবে নিজের হাতে অরণ্যনিধনে মেতে উঠছে তার সুদীর্ঘ বিবরণ তাঁর উপন্যাস। সমরেশ বসু উপস্থিত করেছেন বাস্তব অরণ্যকে, সেইসাথে অরণ্য ও নগরের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে। কালকূট সত্তায় আবার তুলে এনেছেন রোমান্টিকের চোখে দেখা অরণ্যকে। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে অরণ্য ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে উপস্থিত হয়েছে, শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তবভূমি হয়ে এসেছে অরণ্য। আরণ্যক জীবনের অজস্র প্রতিকূলতা ও নাগরিক শোষণের বিরুদ্ধে আরণ্যক উপজাতির সংঘবদ্ধ লড়াই-এর কথা তাঁর উপন্যাসকে আলাদা মাত্রা দেয়। বুদ্ধদেব গুহ বিশাল ভৌগোলিক ব্যাপ্তিতে কথাসাহিত্যে অরণ্যকে হাজির করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে পাঠকদেরও অরণ্যপর্যটনের সুযোগ ঘটে পাঠের মধ্য দিয়ে। তাঁর অরণ্য-উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা অনেকক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে কবিতার মতো এবং গীতিধর্মী। আধুনিক এই কথাকার আরণ্যক পটভূমিকায় তুলে এনেছেন এক তীব্র যৌনবোধ। অরণ্যের সান্নিধ্যে নগর-মানবের মুক্তির আকাঙ্খা, নগর থেকে পালিয়ে অরণ্যে চির-আশ্রয়ের প্রত্যাশা তাঁর উপন্যাসে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ের পারম্পর্যসূত্রে অরণ্য-উপন্যাসের স্বতন্ত্র ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই শেষ অধ্যায়টির অবতারণা।

এই গবেষণা আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে এই কাজ আমার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। বাংলা উপন্যাসে অরণ্য বারবার বিশিষ্ট স্থান দখল করলেও তা নিয়ে কোথাও আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়নি। সেজন্য আমার সামনে অরণ্য-সাহিত্যকেন্দ্রিক কোনো সহায়ক গ্রন্থ ছিল না। এই শূণ্যতা অতিক্রম করতে অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের মূল্যবান পরামর্শ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। যখনই তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছি, অত্যন্ত স্নেহে হাসিমুখে তিনি আমায় সাহায্য করেছেন, ভাবনার নানান দিক খুলে দিয়েছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তাঁর পরিবারের কাছেও, যে নিখাদ অনুপ্রেরণা সেখান থেকে পেয়েছি তা কোনদিন ভুলবার নয়। এই কাজ শুরুই করতে পারতাম না যাঁর অসীম অবদান ছাড়া, তিনি পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ বিনয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনিই আমাকে অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট-এর কাছে নিয়ে যান। তাঁকে আমার শাশ্বত শ্রদ্ধা জানাই।

এই গবেষণার বীজ অন্তরে অঙ্কুরিত হয় 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার রবিবারের সাহিত্যের পাতার জন্য একটি প্রবন্ধ লেখার প্রস্তুতির সূত্রে। সেই লেখাটির দায়িত্ব আমায় দিয়েছিলেন বিভাগীয় সম্পাদক এবং বিশিষ্ট লেখক কঙ্কণ নন্দী। তিনিও জানেন না তাঁর পরোক্ষ অবদান রয়ে গেছে আমার এই গবেষণার অন্তরালে। আমার মা প্রতিভা দে মৌলিক লেখালেখির বিষয়ে আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার তাগিদও এই গবেষণার পেছনে বিশেষভাবে কাজ করেছে। শুধু তাই নয়, কম্পিউটারে আমার পাশে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছেন।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ অরণ্যসাহিত্যের বিশিষ্ট কথাকার বুদ্ধদেব গুহ-র কাছে। শ্রদ্ধেয় এই সাহিত্যিক নিজে হাতে তাঁর অরণ্যকেন্দ্রিক সাহিত্যের তালিকা আমায় লিখে পাঠান। তাঁর চিঠি আমায় বিশেষ উৎসাহ জুগিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অরণ্য ও বনবস্তিতে ঘুরতে ঘুরতে প্রকৃতির প্রতি যে গভীর ভালোবাসা তৈরী হয়েছে, যে মমত্ব ও নৈকট্য প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি, পরোক্ষে তা আমাকে এই গবেষণার দিকে নিয়ে গিয়েছে। তাই আমি বিশেষভাবে ঋণী উত্তরের বনময় শ্যামল প্রকৃতির কাছেও।

গয়েরকাটার শহর গ্রন্থাগার 'জাগৃতি পাঠাগার' ও ধূপগুড়ির শহর গ্রন্থাগার 'মিলনী পাঠাগার' কর্তৃপক্ষের কাছেও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, বহু পুরনো এই দুই গ্রন্থাগার থেকে অনেক বইয়ের সাহায্য পেয়েছি। বই দিয়ে, শুভেচ্ছা দিয়ে আমার গবেষণা-প্রকল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন দিশারী পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট নাট্যকর্মী বিষ্ণুজীবন রায় এবং উত্তরের সৃজনজগতের পরিচিত ব্যক্তিত্ব ডাঃ পার্থপ্রতীম বসু, আবৃত্তিকার ও বাচনশিল্পী শুচিস্মিতা ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক ও কাছের জন নিতাইপদ সরকার এবং আরো অনেকে। গবেষণা-প্রকল্প দ্রুত জমা দেবার জন্য বারবার তাড়া দিয়ে আমার কাজকে অনেকটাই ত্বরান্বিত করেছেন মালবাজারের সিজার স্কুলের সাহিত্যের শিক্ষিকা ও একান্ত স্নেহভাজন সাগরিকা সরকার। সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমার সহধর্মিনী পপি দে। পাশে থেকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছে আমার একমাত্র সন্তান সূর্যোদয় দে (রোদ্দুর)। চিরবন্ধু সমীরের অবদানও নীরবেই সঙ্গে থেকেছে সবসময়।

সাহিত্যে প্রতিফলিত অরণ্য নিয়ে ভবিষ্যতে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং সাহিত্যে অরণ্য আরো গভীরভাবে আসবে - এই প্রত্যাশার পাশাপাশি আমি চাই অরণ্যসাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে মানুষ অরণ্যকে আরো নিবিড়ভাবে ভালোবাসতে শিখুক।

অমিত কুমার দে